

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতিকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

আ হ সান মো হা ম্ম দ

পুজিবাদী অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা মানব মানব দেহে হরমোন নিয়ন্ত্রণকারী গ্রন্থিগুলোর মত। বাইরে থেকে এই গ্রন্থিগুলোর কাজকর্ম ও ক্ষমতা তেমন বোঝা যায় না, কিন্তু তাদের কাজে সামান্যতম গড়বড় হলেই মানব দেহে অস্বাভাবিক ও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। হরমোন প্রবাহের একটু গড়মিলে দিব্যি সুস্থ মানুষটি হঠাৎ শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে পারে বা ফুলে ফেঁপে অতিকায় রূপ নিতে পারে। এমনকি নারী পুরুষে ও পুরুষ নারীতে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে। একইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপের কারণে একটি দেশের অর্থনীতির বারোটা বেজে যেতে পারে। পুজিবাদী অর্থনীতির প্রাণশক্তি হচ্ছে অর্থ প্রবাহ আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে যথাযথ মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ ও সুদের হারকে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ প্রবাহকে এমন পর্যায়ে রাখে যাতে অর্থনীতির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এগুলোর কোনটির ব্যাঘাত ঘটলে দেশের অর্থনীতির উপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। অর্থনীতির ক্রান্তিলগ্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অতি ক্ষুদ্র ভুলের কারণে জাতিকে অনেক বড় মাসুল দিতে হতে পারে। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ততটা নাজুক না হলেও অতি মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে অস্থিরতা, বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং তা মেটাতে চড়া সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ভর্তুকী দেয়া, গার্মেন্টস শিল্পে অস্থিরতা, আগামী কয়েকমাসের সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংঘাত - ইত্যাদি মিলিয়ে আমাদের অর্থনীতি একটি বড় রকমের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

এ ধরনের একটি ঝুঁকিময় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু কিছু ভূমিকা দেশের অর্থনীতি-সচেতন মহলকে উদ্দিগ্ন করে তুলেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে ডলারের দামের লাগাম কোনভাবেই টেনে রাখা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দীর্ঘদিন বিষয়টি নিয়ে গাফিলতি করেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের অস্থিরতা কাটিয়ে উঠতে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয় নি। মুদ্রা বাজারের ক্রমাগত অস্থিরতা সরাসরি প্রভাব ফেলেছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উপর। ধরুন ডলারের দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেল। সাথে সাথে আমাদানিকৃত বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য যেমন চিনি, দুধ, ডাল, পিঁয়াজ ইত্যাদির দাম পাইকরী ব্যবসায়ীরা বাড়িয়ে দিবে, যদিও তারা হয়তো সে সকল পণ্য ডলারের মূল্য বৃদ্ধির আগেই কিনেছিল। একই ঘটনা ঘটে খুচরা বিক্রেতাদের বেলায়। তারাও তাদের পণ্যের দাম এক দফা বাড়িয়ে দেয়। এভাবে কিছুদিন যাবার পর ডলারের দাম কমলেও পাইকরী বিক্রেতারা বেশী দামে কেনা পণ্য কমদামে বিক্রয় করে না। একই কাজ করে খুচরা বিক্রেতারাও। তাছাড়া বাজার দর অস্থিতিশীল থাকলে খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে ইচ্ছামত দাম বাড়িয়ে দেয়ার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। ফলে দেখা যায় মুদ্রা বাজারের অস্থিরতা দ্রব্যমূল্যের উপর দীর্ঘসময় ধরে খারাপ প্রভাব ফেলতে থাকে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের যে অস্থিরতা বিরাজ করছে তার পিছনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইচ্ছাকৃত গাফিলতির একটা অবদান ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকার কারণে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায়ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মাসখানেক আগে একটি বিদেশী ব্যাংকের হোটেল সোনারগাঁ শাখায় সঞ্চয়পত্র কেনার জন্য গিয়েছিলাম।

সঞ্চয়পত্রের ফরম পূরণ করার মাঝে একজন গ্রাহকের সাথে ব্যাংক কর্মকর্তার কথা-বার্তা কানে এলো। ভদ্রলোককে ব্যাংক কর্মকর্তা ভদ্রভাষায় জেরা করছেন, ‘স্যার, আপনি টাকাটা কোথায় পেয়েছেন?’ তিনি রাগ চেপে বললেন, ‘জমি বিক্রি করেছি।’ পাল্টা প্রশ্ন, ‘জমি বিক্রির কোন প্রমাণ কি সাথে আছে?’ তিনি যে জমি বিক্রি করে ব্যাংকে টাকা রাখছেন তা ব্যাংক কর্মকর্তা ডিপোজিট শ্লিপের অপর পিঠে লিখে রাখলেন। গ্রাহক ভদ্রলোক চলে গেলে ম্যানেজার তার একজন সহকারীকে জানতে চাইলেন যে ভদ্রলোক কি করেন। কম্পিউটার থেকে তার সব তথ্য বের করার পর তিনি বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকে জানিয়ে রাখতে বললেন। এ রকম পরিস্থিতিতে কোন দিক থেকে কি হয় এই ভয়ে অনেকেই আর ব্যাংকে টাকা রাখতে সাহস পাচ্ছে না। অনেকেই রিয়েল এস্টেটের মত অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এর ফল পড়েছে দেশের পুজি ও মুদ্রা বাজারে। ব্যাংকগুলোতে দেখা দিয়েছে তারল্য সংকট। পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। তার ফল হয়েছে আরও মারাত্মক। মুদ্রা প্রবাহ কমে যাওয়াতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিরূপ প্রভাব পড়া শুরু হয়েছে।

এ সকল কিছু করা হচ্ছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের দোহাই দিয়ে। অথচ যখন দেশে জঙ্গী তৎপরতা শুরু হয়েছিল এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো হণ্ডে হয়ে জঙ্গীদের অর্থায়নের উৎস খুঁজছিল তখন বাংলাদেশ ব্যাংক রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল। মওলানা মাসউদ নামে একজন অভিযুক্ত জঙ্গী-সহযোগীর একাউন্টে কিছুদিনের মধ্যে কয়েক কোটি টাকা লেনদেন হয়েছিল। এ অর্থ জঙ্গী তৎপরতার পিছনে ব্যয় হয়েছে এরূপ সন্দেহে তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। অথচ, বাংলাদেশ ব্যাংক সে ব্যাপারে কিছুই করেনি। আমরা জানতেও পারিনি কোন ব্যাংকের মাধ্যমে এ লেনদেন ঘটেছে এবং সে ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা। আমাদের মিডিয়াও রহস্যজনকভাবে এ বিষয়ে নিশ্চুপ থেকেছে। সারাদেশে সিরিজ বোমা হামলার পর একের পর আত্মঘাতি বোমা হামলা শুরু হলেও সরকারী এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে কোন প্রকার তৎপরতা দেখা যায়নি। প্রতিষ্ঠানটির তৎপরতা শুরু হয় জঙ্গীনেতাদের গ্রেফতারের পর। জঙ্গী অর্থায়ন বন্ধ করার নামে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে ধরনের তৎপরতা শুরু করেছিল তাতে অনেকেই সরকারী এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যেখানে দেশের ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিভাবক হিসাবে কাজ করার কথা সেখানে প্রতিষ্ঠানটির সহায়তায় একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল এমন খবর ছড়াতে থাকে যে দেশের সবথেকে সফল ব্যাংকটি জঙ্গী অর্থায়নে জড়িত এবং সে অভিযোগে ব্যাংকটি বন্ধ করে দেয়া হতে পারে। তার সাথে তাল মিলিয়ে একটি রাজনৈতিক দল ব্যাংক বন্ধ করার দাবী নিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। অবশ্য দেশের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ কেন্দ্রীয় ব্যাংক, মিডিয়া ও রাজনৈতিক দলের উক্ত ভূমিকার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠলে সে তৎপরতা থেমে যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্প্রতি আরেকটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ইসলামি ব্যাংক নীতিমালা পরিবর্তন করতে গিয়ে। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে যে নীতিমালা অনুসৃত হয়ে আসছে তা থেকে সরে এসে ভিন্ন ব্যবস্থা চালু করতে চাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মালয়েশিয়া সহ পৃথিবীর যে সকল দেশে ইসলামি ব্যাংকিং রয়েছে তাতে শরীয়াহ কাউন্সিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একটু খোলা মনে চিন্তা করলে বিষয়টির যৌক্তিকতা বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। গতানুগতিক ব্যাংকিংয়ের বাইরে ইসলামি ব্যাংক চালুর উদ্দেশ্যই হচ্ছে এটি নিশ্চিত করা যে উক্ত ধারার ব্যাংকগুলো ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হবে। কোন ব্যাংক যে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক চলছে তা নির্ধারণের দুটি পথ রয়েছে - ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়াহ ইউনিট থাকবে যার মাধ্যমে ইসলামি ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম পরীক্ষা করে সকল ক্ষেত্রে ইসলামের আর্থিক বিধান মানার বিষয়টি গ্রাহককে নিশ্চিত করা হবে অথবা খ.

একটি কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিল থাকবে যারা এ কাজটি করবে। যেহেতু বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন শরীয়াহ ইউনিট নেই তাই কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিলের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করার কোন বিকল্প নেই। গত ২৩ বছর ধরে বাংলাদেশেও এ ব্যবস্থা চালু আছে। দেশে এবং দেশের বাইরে দীর্ঘদিন ধরে যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে হঠাৎ করে কি এমন ঘটলো যাতে তা পাল্টাতে হবে? তাছাড়া গতানুগতিক ব্যাংকের ইসলামী শাখা খোলার বিষয়েও কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকিং অত্যন্ত সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসাবে প্রমাণিত হওয়ায় জাপান ও ইংল্যান্ডের মত দেশ সেখানে ইসলামি ব্যাংকিং চালু করার চিন্তাভাবনা করছে। বৃটিশ চ্যান্সেলর অব ট্রেজারী মি. গর্ডন ব্রাউন বলেছেন যে তিনি লন্ডনকে ইসলামি ব্যাংকিং এর চত্রকেন্দ্র হিসাবে দেখতে চান। অথচ বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকিংকে সংকুচিত করার নীতিমালা গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ আত্মঘাতী পদক্ষেপের কোন বোধগম্য কারণ দেখা যাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানটি কোন কারণ দেখানোর প্রয়োজনীয়তাও মনে করছে না। ইসলামি ব্যাংকিংকে সংকুচিত করা হলে তা শুধু যে দেশের দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাই নয় বরং ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে জঙ্গীবাদ মোকাবেলার যে শক্তি বাংলাদেশ অর্জন করেছে তাও বিনষ্ট হবে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক আমলে ইসলামের নামে যে জঙ্গীবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল তার মূল কথা ছিল যে এ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সবকিছুই ইসলাম বিরোধী এবং তাকে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া সংশোধন করা যাবে না। অনেকটা একই চিন্তাধারার অন্য ফ্রন্টের সমর্থকেরা এখনও বিভিন্ন শহরের দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় হরফে গনতন্ত্র, টিভি চ্যানেল সবকিছুকে হারাম ঘোষণা করে চলেছে। তবে ইসলাম সমর্থকদের মূল অংশটি মনে করেন যে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনেক কিছুই ইসলাম সম্মত এবং বাকী বিষয়গুলোকে সুশাসন, মূল্যবোধ, সুবিচার, ন্যায্য অর্থ বন্টন ব্যবস্থা, কল্যাণমূলক অর্থনীতি - ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা যায়। এদের সক্রিয় সমর্থনের কারণেই বাংলাদেশ সফলভাবে জঙ্গী দমন করতে পেরেছিল। জঙ্গী উত্থান দেশের জন্য ছিল একটি অকল্পনীয় দুঃস্বপ্নের মত। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এমন একটি দেশ যার নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীর না আছে সংখ্যাধিক্য, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কিংবা নৈতিকতা; সেখানে হঠাৎ করে মহামারীর মত জঙ্গীবাদ দেখা দিল। শক্তিশালী বিরোধী দল ও মিডিয়ার বৃহদাংশ সে মহামারীর মোকাবেলায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে এমন অবস্থান নিল যাতে সে সুযোগে জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে প্রকারান্তরে জঙ্গীবাদীদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করা যায়। জঙ্গী মোকাবেলার জন্য কৌশল নির্ধারণে সংলাপে বসার জন্য সরকারের আকুল আবেদন বিরোধী দল ফিরিয়ে দিল রুঢ়ভাবে। মনে হচ্ছিল যে বাংলাদেশের জন্য সে রাত্রি আর পোহাবে না। জাতি সেই দুঃস্বপ্নের রাত পার করতে পেরেছিল কারণ ইসলামের সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সম্পৃক্ত করার কাজটি অনেকদূর এগিয়েছিল। ইসলামকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাড় করানোর কোন প্রচেষ্টা তাই সফল হয়নি। বরং ইসলাম এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-স্বার্বভৌমত্ব, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সমার্থক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। দেশের আলেম সমাজ, ইসলামি চিন্তাবিদগণ, ইসলামি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনগুলো একযোগে ঝাপিয়ে পড়েছিল জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে। ফলশ্রুতিতে জঙ্গীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া গিয়েছিল, তাদের অনেকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে তাদের ভুল স্বীকার করেছিল, সর্বোপরি তাদেরকে জনগণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। ইসলামি ব্যাংকিংকে সংকুচিত করা হলে ইসলামকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাড় করানোর প্রচেষ্টা হাতে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলামি ব্যাংক সংকোচন নীতিমালার ব্যাপারে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা সরকারের শীর্ষ মহলকে সতর্ক করে দিয়েছে বলে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংস্থাটি সরকারকে জানিয়েছে যে একদিকে যেমন এর ফলে দেশের পুজিবাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে দেশের অর্থনীতিকে নাজুক অবস্থায় নিয়ে যাবে, অপরদিকে ভোটের রাজনীতিতে ক্ষমতাশীনের জন্য বিরূপ প্রভাব ফেলবে। আগামী নির্বাচনে ক্ষমতাশীল সরকার যেন ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের ভোটের সিংহভাগ না পেতে পারে সে জন্য বিরোধী দল ইতোমধ্যে বিভিন্ন ইসলামি দলের সাথে আঁতাত করছে। তাদের মধ্যে রয়েছে ইনকিলাব গ্রুপ, মাজার ভিত্তিক দলগুলোর ফেডারেশন, চরমোনাই, আটরশী ইত্যাদি পীর কেন্দ্রীক দলগুলো, শায়খ আব্দুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে অভিযুক্ত মওলানা মাসউদের দল ইত্যাদি। ইসলামি ব্যাংক সংকোচন নীতিকে নির্বাচনের সময় বিরোধী দল ও জোট চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে।

কিন্তু সবকিছুকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। ক্ষমতাশীল দল, সরকার, অর্থনীতি, ও জনগণের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ রহস্যময় শক্ত অবস্থান নানা প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। এ সকল প্রশ্নের একটি উত্তর পাওয়া যাবে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি সংবাদে। একটি জনপ্রিয় দৈনিক গত ৮ জুলাই প্রথম পাতায় প্রকাশিত খবরে জানিয়েছে, ‘আমানতকারীদের স্বার্থ বিবেচনা না করে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ধরনের প্রতিষেধকহণের মানসিকতাপ্রসূত সিদ্ধান্তের কারণে আইটিসিএলের আমানতকারীরা তাদের আমানত আজও ফেরত পাননি।’ যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানতদারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সকল ধরনের ব্যবস্থা নিবে, সেখানে তারা কেন প্রতিষেধের খেলায় মেতে উঠেছে? প্রশ্ন হচ্ছে কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ? কেন প্রতিশোধ? সে প্রতিশোধ কি বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যারা বাংলাদেশের শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র পায়ে দলে এগিয়ে যাচ্ছে? প্রতিষেধের কারণটি এ দেশের মানুষের অপ্রতিরোধ্য অর্থনৈতিক গতিময়তা? বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্টগণ আশংকা প্রকাশ করে আসছেন যে দেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটিতে ঘাপটি মেরে থাকা কেউ বা কারা অন্য কোন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন। সে আশংকা এখন সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। গত ২ জুলাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায় যে বাংলাদেশ ব্যাংক রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্তকে গুপ্ত যে স্ট্যান্ড রিলিজ করার পরে আবার চাকুরীতে পুনর্বহাল করেছে তাই নয়, বরং তাকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর পদে বসিয়ে এমন সকল এসাইনমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে যাতে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা ধ্বংস করার তার আসল এসাইনমেন্ট পালন সহজ হয়। সত্যিই বিচিত্র এই দেশ! যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়ার কথা, সেখানে তাকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে এবং পুনরায় দেশের ক্ষতি করার সকল সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কোন দল বা ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। এমনকি এটি বিদেশী অর্থে পরিচালিত কোন এনজিওও নয়। দেশের জনগণের কলের অর্থে পরিচালিত এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রদ্রোহীদের আখড়ায় পরিণত হয়ে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজানোর কাজ করে যেতে হবে তা হতে দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটিকে জনগণের কাছে তার অবস্থানকে খোলসা করে বলতে হবে। জবাব দিতে হবে সরকারের শীর্ষ মহলকে। দেশকে ধ্বংস করার অধিকার কারো নেই, তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন। দেশের সুশীল সমাজ, মিডিয়া, রাজনীতিক ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে।